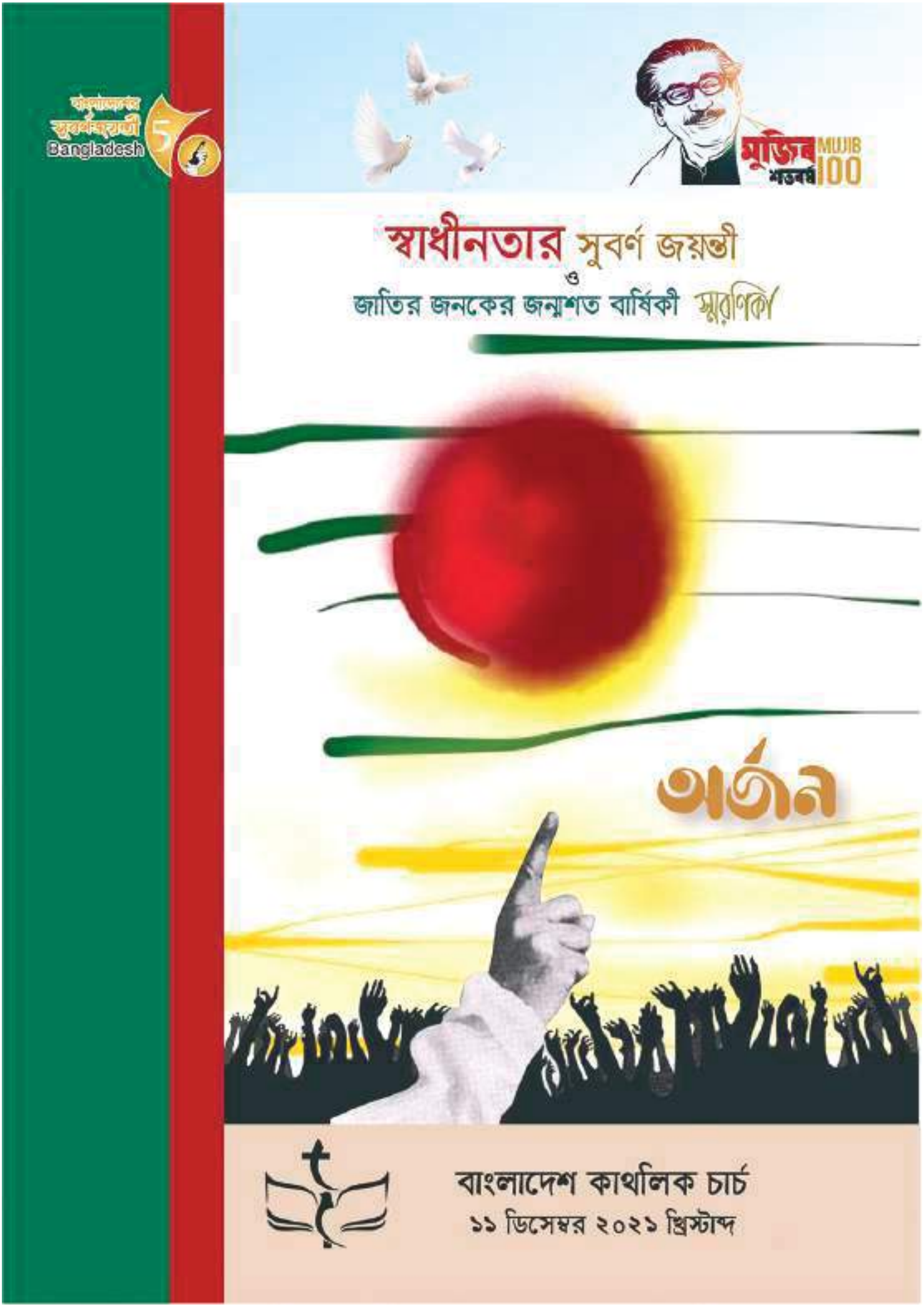

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী
ও
জাতির জনকের জন্মশত বার্ষিকী স্মরণিকা

অর্জন

বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ

১১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অংশগ্রহণ করে। উপাসনাকালে নির্দিষ্ট প্রার্থনার সাথে গীত-সংগীত গাওয়া হয়, যাতে ছোট-বড় সবাই কণ্ঠ মিলিয়ে থাকে। অন্য ধর্মাবলম্বীরা জেনে অবাক হবেন যে, খ্রিস্টিয় উপাসনা সংগীতে রবীন্দ্র গীতি, নজরুল গীতি, দ্বিজেন্দ্র-গীতি এবং দেশাত্মবোধক-ভক্তিমূলক গানও গাওয়া হয়। যেমন- " ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা", "এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী", " অঞ্জলী লহ মোর সঙ্গীতে", "ধন্যধান্যে পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা" এমনি অনেক গান। আর এসব গানের জন্য রয়েছে খ্রিস্টিয় গানের বই, "গীতাবলী"। এই গীতাবলী বই-এ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতও বিশেষ মর্যাদায় স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ খ্রিষ্টানগণ ছোটবেলা থেকে ঈশ্বরবন্দনা করার পাশাপাশি, দেশমাতৃকার বন্দনা করে অন্তরে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে ও ধারণ করে। বাংলা ও আদিবাসী ভাষায় রচিত কয়েকটি গানের বই-এর নাম উল্লেখ করছি, যেমন, গীতাবলী, খ্রিষ্ট-সঙ্গীত (বিবিসিএস), ধর্ম-গীত (ব্যাপ্তিষ্ট মন্ডলী), সেবক সঙ্গীত, জীবন সঙ্গীত, গারোদের গানের বই মান্দি ভাষায় "খ্রিংনি বিবাল", সাওতালদের সান্তাল ভাষায় গানের বই, "বাহা সানদেস", ত্রিপুরা ভাষায় খ্রিষ্টীয় প্রার্থনা পুস্তক, "সুব্রাইনি লামা" ও ত্রিপুরা-বাংলা ভাষার গানের বই "Khristan Rwchabmung", ইত্যাদি- উল্লেখযোগ্য।

গীর্জায় উপাসনাকালে সুনীল দত্তের একটি গান আমার হৃদয়-মনকে উদ্বেলিত করে তোলে- শুধু ঈশ্বরপ্রেম নয়, এসব হৃদয়গ্রাহী গান স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করে।

সেবা কর দুঃখী জনে, সেবা কর আর্তজনে
সেই তো তোর খ্রীষ্টসেবা।।
চোখের জলে হাহাকারে যে বসে রয় পথের ধারে
তাকে তুলে নে ভাই, সেই তো তোর খ্রীষ্টসেবা।।
গান করা যে শুধু ভালো, প্রার্থনা যে আরও ভালো
সবার চেয়ে ভালো যে ভাই, ঘুচাও যদি মনের কালো।
প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে আঁধার পথে চল এগিয়ে
ব্যথার শ্রাবণ ভরবে নয়ন, সেই তো খ্রীষ্টসেবা।।

১১. বাংলাদেশের কাথলিক মন্ডলী "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী" নামক একটি নিয়মিত বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করে। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং অন্যান্য জাতীয় দিবসে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। সেখানে প্রকাশিত প্রবন্ধ,গল্প, কবিতা, গবেষণামূলক, দেশাত্মবোধক রচনা থাকে যা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পাঠ করার উপযুক্ত। এছাড়া খ্রিষ্টিয় যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্দিপনামূলক ভিডিও/সিডি তৈরী করে সম্প্রচার করা হয়। এতে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রকাশের পাশাপাশি দেশ গঠনমূলক বার্তা থাকে। ব্যাপ্তিষ্ট মণ্ডলীর পরিচালনায় একটি পাক্ষিক পত্রিকা, "স্বর্গ-মর্ত" এবং এসসিসিবি'র "মাসিক সমতান" নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে অনেক বছর ধরে। অবদান রাখছে, বাংলা সাহিত্যে এবং দেশ গঠনমূলক প্রবন্ধ/রচনা প্রকাশ করে।

১২. একজন সমর দাস : "মানুষ মানুষের জন্য"- মানবতাবাদী সমর দাসকে খুঁজে পাওয়া যায় ১৯৭০ সনের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের পরদিন মানবতাবাদী দেশপ্রেমিক সমর দাস সাধারণ মানুষের বিবেক জাগ্রত করার মহান ব্রতে রাজপথে নেমে এসেছিলেন, "কাঁদো বাঙ্গালী কাঁদো" শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার তলে। শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজকর্মী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন পল্টন ময়দানে দুর্গত মানবতার সহায়তায় তহবিল সংগ্রহের জন্য। "কাঁদো বঙ্গালী কাঁদো" শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে বিপুল তহবিল গঠন করেছিলেন সমর দাসের সাংস্কৃতিক দল।

বাঙ্গালীর স্বাধীকার আন্দোলনে একাত্তরের মার্চের সেই উত্তাল দিনগুলোতে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের মিছিলে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহুত অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সমর দাসের উপস্থিতি ছিল প্রথম সারিতে। ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই তিনি লোভনীয় রেডিও পাকিস্তান ও টেলিভিশনের চাকুরি/সুবিধা ছেড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যোগ দেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মুখ্য সংগীত পরিচালক হিসেবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের শব্দ সৈনিক হিসেবে তাঁর সুরারোপিত অসংখ্য গান প্রচন্ডভাবে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণকারী অকুতোভয় মুক্তিবাহিনীর বীর সেনানীদের সাথে সাথে উজ্জীবিত করেছে সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী বাঙ্গালীকে। তাঁর সুরারোপিত গান আজও আমাদের সংগ্রামী চেতনায় উদ্বেলিত ও শিহরিত করে। "পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে- রক্ত লাল, রক্ত লাল"; "নোঙ্গর তোল তোল, সময় যে হোল হলো"; "ভেবো নাকো মা তোমার ছেলেরা হারিয়ে গিয়েছে পথে"- আরো কত গান! এ সকল গানের সৃষ্টি তো হয়েছে তাঁর অফুরন্ত স্বদেশ প্রেম থেকে। বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্তিম ভালবাসায় নিবেদিত সমর দাস বাংলাদেশ বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, অডিও মাধ্যমসহ সংগীতের সকল ক্ষেত্রে বিচিত্র ও বহুমুখী স্বাক্ষর রেখে গেছেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের সফল ও সার্থক আর্কেস্ট্রেশনের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। তাঁর দেশপ্রেমের স্বীকৃতি স্বরুপ বাংলাদেশ সরকার তাঁকে দিয়েছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার, "স্বাধীনতা পদক"।

১৩. বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে, রাস্তা-ঘাট অবকাঠামো উন্নয়নে, শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং সামাজিক সচেতনামূলক, বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুর্ণবাসন কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে কয়েকটি খ্রিস্টান এনজিও। এদের মধ্যে কারিতাস বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এবং সিসিডিবিসহ আরো কয়েকটি খ্রিস্টান সংস্থা বিতর্কের উর্দ্ধে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থাগুলোতে নিয়োজিত খ্রিষ্টান, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, বাঙ্গালী, আদিবাসী কর্মীগণ একত্রে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রেখে মানবতার জন্য কাজ করে। তাদের ভিতরে পারস্পরিক ভালবাসা, বিশ্বাস ও স্বদেশপ্রেম আছে বলেই তারা সম্মিলিতভাবে সমাজ উন্নয়নে দেশ গঠনে কাজ করে যাচ্ছে।

১৪. বাংলাদেশে বিদেশীদের অন্যরকম দেশপ্রেম : ইতিহাস বলে প্রাচীনকাল থেকে এদেশে (বঙ্গদেশে) অনেক বিদেশীরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এসেছেন, কেউ পর্যটক, কেউ ধর্মপ্রচার, কেউবা বাণিজ্য করতে বা যোদ্ধা হিসেবে। বাংলাদেশের নদী-নালা, হাওর-বাওর, সবুজ প্রান্তরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে এদেশের মাটি মানুষের প্রেমে পড়ে তাদের আর নিজ দেশে ফিরে যাওয়া হয় নি। কালক্রমে এদেশই হয়েছে তাদের স্বদেশ/মাতৃভূমি। স্বাধীন বাংলাদেশেও এরকম কয়েকজন রয়ে গেছেন, যারা মনে প্রাণে এদেশের মানুষকে ভালবেসে বাংলাদেশী হয়ে গেছেন।

এদের একজন হলেন, ফাদার মারিনো রিগন। সুদূর ইতালী থেকে খ্রিষ্টান ধর্মীয় যাজক হিসেবে ১৯৫০ সনে পূর্ব বঙ্গে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) এসেছিলেন। ধর্মীয় কাজের পাশাপাশি তিনি শিশুদের শিক্ষা, দুস্থ মহিলাদের সহায়তা করতে শুরু করেন। তিনি দ্রুত বাংলা ভাষা শিখেন এবং এক সময় বাংলা ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসিমউদ্দিন ও বাংলা সাহিত্যের অনুরক্ত পাঠকই হলেন না তিনি, নিজেই বাংলায় প্রবন্ধ লিখলেন। বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পেলেন জীবন। অতপরঃ তিনি জসিমউদ্দিনের নক্সীকাথার মাঠ, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী, লালনের অসংখ্য গান ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রমান করলেন তিনি কত বড় বাঙ্গালী! তাঁর অনূদিত বই আবার অনুবাদকরা ফরাসী, ইংরেজী, জার্মান ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের বিশ্বায়ন ঘটালেন।

বাংলাদেশ অন্তঃপ্রাণ ফাদার রিগনের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সৈনিক। ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন বানিয়ারচর মিশনে। সেখানে অসংখ্য আহত মুক্তিযোদ্ধা, নারী-পুরুষকে আশ্রয় দিয়েছেন, ঔষধ, পথ্য ও চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। দক্ষিণাঞ্চলের হেমায়েত বাহিনীর কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিনকে তিনি আশ্রয় ও চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করেছেন। এভাবেই বাংলাদেশ হয়ে উঠে ফাদার রিগনের স্বদেশ। বাংলাদেশ সরকার তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ দিয়েছেন বাংলাদেশের নাগরিকত্বসহ রাষ্ট্রিয় সম্মাননা। এখানেই শেষ নয়, খ্রিস্টান পাদ্রি মারিনো রিগনের শেষ ইচ্ছা ছিল, মৃত্যুর পর যেন তাঁকে বাংলাদেশে সমাধিস্থ করা হয়। তিনি চিকিৎসারত অবস্থায় ইতালীতে মৃত্যুবরণ করেন। এর এক বছর পরে বাংলাদেশ সরকার নিজ দায়িত্বে তাঁর দেহ বাংলাদেশে এনে তার নবজন্মের স্থান বাগেরহাটের মংলায় শেলাবুনিয়া চার্চ প্রাঙ্গনে সমাধিস্থ করে। এভাবেই একজন দেশপ্রেমিক খ্রিস্টান তাঁর স্বদেশ প্রেমের সাক্ষ্য দিয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে দিয়েছে, "মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা"।

একজন বৃটিশ তরুনী মাত্র ২০ বছর বয়সে ১৯৫০ সনে বাংলাদেশে এসেছিলেন সেবিকা হিসেবে কাজ করতে, নাম তার লুসি হেলেন হল্ট। প্রথমে তিনি বরিশাল অক্সফোর্ড মিশন চার্চের প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৭১ সনে তিনি যশোরের ক্যাথলিক চার্চে ইংরেজী শেখানোর দায়িত্ব পালন করছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকেই যশোহরে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। পাকিস্তান সামরিক জান্তা তাকে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছিল। লুসি সেই নির্দেশ অমান্য করে সেখানে থেকে যান এবং যশোহর ফাতেমা হাসপাতালে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় অবস্থান করে আহত মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আমাদের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ সংযুক্ত হয়েছেন। তিনি ইংল্যান্ডে থাকা তার মা ও বোনকে গোপনে চিঠি পাঠিয়ে এদেশে ঘটে চলা অত্যাচার-জুলুমের কথা জানাতেন। কিভাবে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী বাঙ্গালী মুক্তিকামী জনগণের উপর পৈশাচিক নির্যাতন চালাচ্ছে, তা বর্ণনা করতেন এবং বৃটিশ জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য অনুরোধ করতেন।

যুদ্ধশেষে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি আগের মত মানবতার কল্যাণে কাজ করে যেতে থাকেন। সিস্টার লুসি আপন মনে নীরবে-নিভৃতে কাজ করে গেছেন। একসময় তিনি নিজের অজান্তেই বাঙ্গালী হয়ে গেছেন। শুধু গায়ের রং ছাড়া চলনে বলনে, সংস্কৃতিতে, মনে প্রাণে তিনি বাংলাদেশী হয়ে নবজন্ম গ্রহণ করলেন। বয়স বাড়তে থাকে, তাঁর অন্তরের বাসনা, তিনি বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন। এই মানবপ্রেমী স্বদেশী বিদেশিনীকে দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বরিশাল অক্সফোর্ড মিশনে। তিনি শাড়ি পরে ছিলেন, যেন একজন বাঙ্গালী ঠাকুমা! সদাশয় বাংলাদেশ সরকার তাঁকেও মুক্তিযোদ্ধার সম্মান দিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে একজন স্বদেশপ্রেমীর মর্যাদা দিয়েছে।

আমার আলোচনার তৃতীয় ব্যক্তি হলেন ভ্যালেরি এ্যান টেইলর। যাঁকে বাংলাদেশের অগনিত মানুষ সি.অর.পি.'র

ভ্যালেরি বলে জানেন। তিনিও খুব তরুণ বয়সে যুক্তরাজ্যের কেন্ট শহর থেকে ১৯৬৯ সনে মাত্র ২৬ বছর বয়সে বাংলাদেশে আসেন ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে কাজ করার জন্য। তিনি চট্টগ্রামের নিকট অবস্থিত চন্দ্রঘোনা খ্রিস্টান হাসপাতালে যোগদান করেন।

প্রথম দর্শনেই বাংলাদেশের প্রেমে পড়েছিলেন ভ্যালেরি এ্যান টেইলর। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভেলেরিকে যেমন মুগ্ধ করেছিল তেমনি এদেশের মানুষের দুঃখ, দুর্দশা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার দরবস্থা তাকে ব্যথিত করেছিল। তাইতো এদেশে পা দিয়েই স্বপ্ন দেখেছিলেন মানবসেবায় কাজ করবেন। নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন বাংলাদেশের মানুষের জন্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দেখতে পেলেন যুদ্ধের কারণে মুক্তিযোদ্ধাসহ বহু মানুষ আহত ও পঙ্গু হয়ে রয়েছে। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাদের চিকিৎসা সেবা দিতে। একাজের মধ্যেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশে পঙ্গুত্বআক্রান্তদের জন্য একটি হাসপাতাল গড়বেন। একসময় তিনি ঢাকার সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে কাজ করছিলেন। ১৯৭৯ সালে এই হাসপাতালের দু'টি পরিত্যক্ত গুদামঘরে তিন চার জন রুগি নিয়ে শুরু করেন তাঁর স্বপ্নের সি.আর.পি.। সেই ছোট্ট সিআরপি এখন এক বিশাল মহিরুহ। ভ্যালেরি বলেছিলেন, "আমি যতদিন বাঁচব, ততদিন বাংলাদেশের মানুষের জন্যই কাজ করে যাব"; এর চেয়ে বড় দেশপ্রেমের কথা আর কি হতে পারে!

তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ তিনি ১৯৯৬ সনে আর্থার আয়ার স্বর্ণপদক লাভ করেন। স্বাস্থ্য সেবায় অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৯৮ সনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন। ২০০৪ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক স্বীকৃতি হিসাবে "স্বাধীনতা পদক" লাভ করেন। সুতরাং ভেলেরী টেইলর একজন খ্রিস্টান হিসেবে নয়, বাংলাদেশের মানুষ হিসাবে তাঁর অফুরন্ত স্বদেশপ্রেম দেখিয়ে চলেছেন।

১৫. বাংলাদেশী খ্রিষ্টানদের স্বদেশপ্রেমের পরীক্ষা : পাকিস্তান আমলে থেকে বাংলাদেশের খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠি বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক খ্রিষ্টানগণ কখনোই হতাশ হয়নি, দেশত্যাগের চিন্তা করেনি। ষাটের দশকে পারো সম্প্রদায়ের উপর অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছিল, তাদের অনেককে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে সীমান্তের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা মাতৃভূমির টানে আবার ফিরে এসেছে। নিকট অতীতে বানিয়ারচর খ্রিস্টান গীর্জায় উপাসনা চলাকালে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দশ জন খ্রিস্টভক্তকে হত্যা ও অনেককে আহত করা হয়। দিনাজপুর ডায়োসিসের অধীন কুলাকিপুরে খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান ও সাঁওতাল পল্লীতে হামলা চালায় সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা। অপর এক ঘটনায় একজন আদিবাসী খ্রিষ্টানকে হত্যা করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামেও খ্রিষ্টান গ্রাম ও মানুষের উপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাড়ি-ঘর, জমি-জমা দখল, ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু খ্রিষ্টান জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে ধৈর্য্য সহকারে সমস্যা মোকাবেলা করেছে। এসব সম্ভব হয়েছে তাদের স্বদেশপ্রেম ও প্রতিবেশীদের প্রতি ভালবাসার কারণে।

১৬. আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়, বাংলাদেশে খ্রিষ্টানগণ, "লবনের মত"। এক থালা ভাতের এককোনে পড়ে থাকা লবন যেমন খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধিতে অত্যাবশ্যক, তেমনি বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠির মাঝে বৈচিত্র সৃষ্টিতে স্বল্পসংখ্যক খ্রিস্টানদের উপস্থিতি ঈশ্বরেরই পরিকল্পনার অংশ এবং বাংলাদেশের পরিপূর্ণতার জন্য অত্যাবশ্যক। ষোল/সতের কোটি মানুষের দেশে কয়েক লক্ষ খ্রিষ্টানদের অবস্থানের মূল শক্তি হোল সর্বস্তরের মানুষের প্রতি ভালবাসা ও স্বদেশপ্রেম।

উপসংহারে বলতে চাই যে, একটি দেশের স্বদেশপ্রেম দেশরক্ষার জন্য মিসাইলের চেয়েও শক্তিশালী।

একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধের কথা বলি। মহাবীর আলেকজান্ডার (আলেকজান্ডার দি গ্রেট) অপ্রতিরোদ্ধ গতিতে একের পর এক দেশ জয় করতে করতে সিন্ধুর রাজার দিক থেকে বাঁধা পেয়ে বিস্মিত হয়ে শিকলে বন্দী রাজা মিয়াপুরুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,"আমি তো শুনেছিলাম তুমি পন্ডিত, তুমি বিদ্বান। এই তোমার পন্ডিত্তি, তুমি আমার বিশাল বাহিনীকে বাধা দিতে গেলে! তোমার একটুও মনে হলো না যে তুমি খর কুটোর মত উড়ে যাবে?" মহাপুরু আলেকজান্ডারকে বলেছিলেন, "আমি সবই জানতাম এবং বুঝতাম তোমার কাছে আমার পরাজয় অবশম্ভাবী। তবু আমি দেশপ্রেমে মাতৃত্বের সম্মান রক্ষায় তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছি। আমি এ মাটিতে জন্ম নিয়েছি, এ মাটি থেকে জন্ম নেওয়া খাদ্য খেয়ে দেহ রক্ষা করেছি, এখানকার আলো বাতাস আমায় পুষ্টি জুগিয়েছে। আমি আমার মাকে, আমি আমার ধরিত্রীকে বিনা বাঁধায় কোনো বিদেশীর হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। তাই পরাজয় নিশ্চিত জেনেও আমার মায়ের প্রতি, মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য পালন করেছি"। মহাপুরুর এই কথা শুনে মহাবীর আলেকজান্ডার সেখান থেকে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "মিয়াপুরু, তোমার মাতৃভূমি শাসনের আমার কোন অধিকার নেই। তুমি তোমার দেশ শাসনের সত্যিকার উপযুক্ত।" বিনা বাক্যব্যয়ে মহাবীর আলেকজান্ডার সিন্ধু থেকে ফিরে গিয়েছিলেন। দেশপ্রেমের এমন জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখে আলেকজান্ডার অভিভূত হয়েছিলেন।

(লেখক: অনুজীব বিজ্ঞানী ও এনজাইম বায়োটেকনোলজিষ্ট, চীফ সাইন্টিফিক অফিসার (অবসরপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট, কো-অর্ডিনেটর: আঠারগ্রাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, প্রাক্তণ প্রেসিডেন্ট: আঠারগ্রাম খ্রিস্টান কল্যাণ সমিতি, সমাজ, মন্ডলী ও ইতিহাস বিশ্লেষক।)

বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা পরবর্তী পুনর্গঠনে দেশী- বিদেশী খ্রিস্টান ডাক্তার ও নার্সদের ভূমিকা

ডা: নেভেল রোজারিও

একাত্তরের ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পরিচালিত Operation Searchlight' এ পৃথিবীর ভয়ংকরতম গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বাঙ্গালী- আদিবাসী নির্বিশেষে বাংলাদেশের নিরীহ জনগণ হাতে তুলে নেয় অস্ত্র, সারা দেশজুড়ে গড়ে তুলে প্রতিরোধের ব্যাংকার। শুরু হয় হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান, সমতল ভূমির বাঙ্গালী আর পাহাড়িয়া এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত জনযুদ্ধ- মুক্তির লড়াই তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম।

পাকিস্তানী শাসন, শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ও আমাদের সবার ত্যাগের বিনিময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে স্বাধীন বাংলাদেশ জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান- সমতলের বাঙ্গালী ও পাহাড়ী আদিবাসী সবার মিলিত সংগ্রামের ফলে গড়ে উঠেছিল ধর্মনিরপেক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বপ্ন। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ০.০৩ শতাংশ (০.০৩%)। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্মিলিত এ জনযুদ্ধে বিশেষ কোন ধর্মবিশ্বাসের কারণে তা আলাদাভাবে উল্লেখের সুযোগ না থাকলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশসেবায় অনুপ্রেরণা ও আগ্রহী করার জন্যে মহান মুক্তিযুদ্ধকালে ও স্বাধীনতার পরে দেশের পুর্ণগঠনে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের অবদান বিশেষ করে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

ফাদার মারিনো রিগন মিশনারী হিসেবে বাংলাদেশ এসে এদেশের চরম দুঃসময়ে এদেশের মানুষের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেন নিজেকে। মুক্তিযুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে এদেশ থেকে চলে যাওয়ার পরিবর্তে ফাদার রিগন এদেরই একজন হয়ে এদের পাশে দাঁড়ান পরম বন্ধুর মত। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি গোপালগঞ্জের বানিয়ারচর গির্জায় ছিলেন। পিমে সম্প্রদায় থেকে ছুটির প্রস্তাব আসলে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি জানিয়ে দেন যে বাঙ্গালীর দুঃসময়ে তিনি তাদের পাশেই থাকবেন। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যা-লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগের কারণে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিজ চোখে দেখে যুদ্ধ পীড়িত ও যুদ্ধাহত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন, চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য ঢেলে সাজালেন নিজের ক্ষুদ্র চিকিৎসা কেন্দ্রটি। ফাদার রিগ্যান মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় অসুস্থ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও সেবা প্রদানের পাশাপাশি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীর মতো। হেমায়েত বাহিনী প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েতউদ্দীন বীর বিক্রম সহ অনেক যুদ্ধাহত মুক্তিদ্বাদের গোপনে আশ্রয় দিয়ে চিকিৎসা সেবা দান করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েতউদ্দীন বীর বিক্রম পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে এক সম্মুখযুদ্ধে মুখমণ্ডলে গুলিবিদ্ধ হন। শত্রুর বুলেট তার মুখের বামপাশ দিয়ে ঢুকে চোয়ালের দাঁতসহ ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। জিহ্বার একটি টুকরাও সেই সঙ্গে উড়ে যায়। দলের চিকিৎসকদের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসা পাওয়ার পর আরও ভাল চিকিৎসার জন্য যান ফাদার রিগ্যানের চিকিৎসাকেন্দ্রে। ফাদার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তার শরীরে অস্ত্রোপচার করান। তখন ওপরে ছিল ঈশ্বর, নিচে ফাদার রিগন। মানবসেবা, সৃজনশীল কর্মকান্ড ও মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে ফা: মারিনো রিগ্যানকে Freiends of Liberation War (মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু) পদকসহ বাংলাদেশের সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করে।

হেমায়েত বাহিনী প্রধান কমান্ডার হেমায়েতউদ্দীন বীরবিক্রম মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্যে বরিশালের আগৈলঝড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন পয়সার হাট মুক্তি হাসপাতাল। এ হাসপাতালের ডাক্তার হিসেবে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও আহত জনগণকে চিকিৎসা প্রদান করেন ডা: যোগেশ্বর বিশ্বাস। সাথে ছিলেন ফার্মাসিস্ট বি কে রঞ্জিত, নার্স মোনা রানী ব্যানার্জী ও বরিশাল সদর হাসপাতালের মেট্রন সুপ্রিয়া বিশ্বাস। এরা চার জনই ছিলেন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী।

১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ডা: প্যাট্রিক বিশ্বাস রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং বরিশালের সাটনা গ্রামে অবস্থান করছিলেন। পয়সার হাট মুক্তি হাসপাতাল ফার্মাসিস্ট রঞ্জিত মারফত মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হেমায়েতউদ্দীনের সাথে পরিচিত হলে জোবায় পাড়ের আসকর গ্রামে পরিত্যক্ত এক হিন্দু বাড়িতে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্যে কমান্ডার হেমায়েতউদ্দীন প্রতিষ্ঠিত মুক্তিবাহিনী হাসপাতালে কাজ করতে আহ্বান জানান। তিনি জুন মাস থেকে ডিসেম্বর ২৬ পর্যন্ত কাজ করে যুদ্ধাবশেষে মেডিকেল কলেজে যোগ দিয়ে এমবিবিএস ডিগ্রী অর্জন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে নাগরী মিশনের নিকট ও দূরবর্তী হিন্দু লোকালয়ে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর অগ্নিসংযোগ, অত্যাচার ও গণহত্যার কারণে দলে দলে আশ্রয় নিতে থাকে নাগরী মিশন কেন্দ্রে। নাগরী মিশনের পালপুরোহিত আমেরিকান পাদরী Fr. Edmund N Goedert csc পরিচালিত এ আশ্রয় শিবিরে দিনে দিনে প্রায় ৪০,০০০ গৃহহীন উদ্বাস্তু এসে হাজির হয়। এ বিশাল শরণার্থীর আশ্রয় ও খাদ্য যোগানের পাশাপাশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে চিকিৎসার সেবা। সে সময় এগিয়ে আসেন ডা: বার্ণাড রোজারিও (বেণু ডাক্তার)। তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে ছিলেন মিশনের মেডিকেল সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মিশনারী সিস্টারবৃন্দ। তাঁরা উদ্বাস্তু দুর্গত জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবা যেমন দিতেন তেমনি করে গোপনে চিকিৎসা দিতেন মুক্তিযোদ্ধাদের। জুলাই মাসের ২৫ তারিখে একদল মুক্তিযোদ্ধা দড়িপাড়া গ্রাম সংলগ্ন নলছাটা রেলওয়ে ব্রিজ চলন্ত ট্রেনসহ উড়িয়ে দেয়। আহতদের চিকিৎসার জন্যে ডা: বার্ণাড ও ফা: গের্ডাট সাদা পতাকা উড়িয়ে নৌযোগে ঘটনাস্থলে অগ্রসর হওয়াকালে পাক বাহিনী গুলি ছুঁড়লে তারা পানিতে ঝাপ দিয়ে প্রাণে বেঁচে যান। সপ্তাহ খানেক পরে পাক বাহিনী নাগরী মিশনে এসে বার্ণাড ও লীনাকে খুজলে ফা: গের্ডাট সিএসসি সে রাতেই ডা: বার্ণাড ও লীনাকে নাগরী ছেড়ে দেশান্তরে যাবার উপদেশ দেন। সে রাতেই তারা সপরিবারে আগড়তলা অভিমুখে রওনা দেন। পেছনে পড়ে থাকে নাগরী হাই স্কুলের মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা কেন্দ্র, বাগদী স্কুলের মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা কেন্দ্র, ভাসানিয়া গ্রামের আনারস বাগানের মাঝখানে লুকানো মোমবাতি হারিকেন জ্বালানো সার্বক্ষণিক চিকিৎসাকেন্দ্র।

ডা: বার্ণাড রোজারিও পরিবারসহ উদ্বাস্তু হয়ে বহু খড়কুট পুড়িয়ে ত্রিপুরা পৌছান। সেখানকার মরিয়মনগর মিশনের পাল-পুরোহিত কানাডিয়ান ফা: জর্জ লেকসেয়ার তাদেরকে মিশনে স্থান দেন। ফা: ডাক্তার পরিচয় জেনে ডা: বার্ণাড রোজারিও কে ৮২ মাইল শরনার্থী শিবির এ চিকিৎসা সেবার জন্যে পাঠিয়ে দেন। আগরতলার কানচনছড়া পাহাড়ী গ্রামে থাকার ব্যবস্থা করে ডা: বার্ণাডকে শরনার্থী শিবিরের দায়িত্ব দেয়া হল। CARITAS India এর পক্ষে ফা: জর্জ লেকলেয়ার এবং সরকারের পক্ষে মেজর মাইকেল শরণার্থী শিবিরগুলো পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। ডা: বার্ণাডের উপর ন্যস্ত ছিল শিবিরের স্বাস্থ্যগত ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা। সব কাজ শেষে ১৯৭২ এর ১০ মার্চ ডা: বার্ণাড রোজারিও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ফা: হোমরিক সিএসসি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও ভারত থেকে আনা তাদের অস্ত্রাদি ও গোলাবারুদ রাখায় সহায়তা দেয়ার কারণে হানাদার পাকিস্তানী সেনারা জলছত্র মিশন আক্রমণ করে ফা: হোমরিক সহ ৩২ জন গারো আদিবাসীকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের সবাইকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে, বিদ্রোহীদের সহায়তা করাতে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার জন্য জানানো হয়। অকুতোভয় সাহসী ফা: হোমরিক জানতেন অনেক পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা US ট্রেনিং প্রাপ্ত। তিনি সাহস করে কমান্ডারকে প্রশ্ন করলেন, অফিসার কোন দেশ থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত। অফিসার জানালো Camden, New Jersy. ফা: হোমরিক জিজ্ঞেস করলেন যে উনি কি চান যে আমেরিকার জনগণ পরদিনের পত্রিকার Head line থেকে জানুক যে আমেরিকায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন অফিসারের গুলিতে একজন আমেরিকান পাদ্রীকে হত্যা করা হয়েছে। পাক অফিসার তখন ফাদার সহ সবাইকে মুক্তি দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোটা সময় ফাদার আশেপাশের হিন্দু ও আদিবাসী উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেন এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করেন। ২০১২ সনে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার জন্যে ফা: হোমরিক সিএসসি আরো পাঁচজন কাথলিক পাদ্রীর সাথে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির হাত থেকে Friends of Bangladesh সম্মানে ভূষিত হন। ফা: হোমরিক তার প্রবেশ পথের দরজার উপরে তা গর্বের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।।

পুরান ঢাকার ন্যাশনাল হাসপাতাল থেকে এল.এম.এফ. পাশ করা ডাক্তার ইগ্নেশিউস গমেজ মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বিক্রমপুরের শুলপুর মিশনের মজিদপুর গ্রামের জমাদার বাড়িতে (সাক্ষরীর বাড়ি নামে পরিচিত) আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হিংস্র ছোবল থেকে বাঁচার তাগিদে নিজের ভিটে-মাটি ছেড়ে পালিয়ে এসে বিভিন্ন খ্রিষ্টান বাড়ি, মিশনে সহায়-সম্বলহীন, কপর্দকহীন হয়ে আসা আশ্রিতদের ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে তিনি পাশের অমরদের বাড়িতে চলে যান। তিনি শাস্ত্রীয় ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের স্বনামধন্য ওস্তাদ, একুশে পদকপ্রাপ্ত ওস্তাদ চার্লী গমেজের মেজ ছেলে।

Dr Ronald Joseph Gast, a US Missionary ১৯৭১ সনে ভারতের লুদরিয়ানা খ্রীষ্টান মেডিকেল কলেজে মিশনারী হিসেবে আর্ত-পীড়িতদের চিকিৎসা সেবা দেয়াকালীন সময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় জনগণের কথা শুনে আন্তর্জাতিক সীমানায় অবস্থিত যুদ্ধশিবিরগুলোতে ছুটে আসেন। সেখানে যুদ্ধাহত অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্দশায় বিচলিত প্রাণ ডা গাষ্ট এর উদ্যোগে চিকিৎসা সেবা শুরু করেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর চিকিৎসা ও সেবাকাজ সম্পর্কে অবগত হয়ে জাষ্টিস আবু সাঈদ চৌধুরী তাকে বাংলাদেশে কাজ করার আহ্বান জানালে ডা: গাষ্ট ১৯৭২ সনে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে আসেন। সে সময় মোহাম্মদপুর কলেজ গেটে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধায় ভরপুর ছিল। এ অবস্থায় তিনি প্রথম একটি অর্থোপেডিক হাসপাতাল শুরু করতে ব্রতী হন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও সহযোগিতায় শহীদ সোহরাওর্দী হাসপাতালের আউটডোরকে অপারেশন কক্ষসহ ১০০ বেডের অর্থোপেডিক ওর্য়াডে রূপান্তরিত করে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা শুরু করে দেন। পরের মাসেই তা ১৫০ বেডে উন্নীত হয়। ১৯৭৩ এর শুরুতে সোহরাওর্দী হাসপাতালের ছাদে শুরু করা হয় মহিলা ও শিশুদের অর্থোপেডিক চিকিৎসার ওর্য়াড। ঐ একই বছর শুরু করা হয় কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরী ও প্রতিস্থাপন। প্রথম বছরেই ১০০০ কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উৎপাদন ও প্রতিস্থাপন করা হয়। ১৯৭৪ সনে RIHD Project চালু হলে Dr. Gast মাত্র মাসিক ১ টাকা (০.০৭ সেন্ট) বেতনে Project Director হিসেবে দায়িত্ব নেন। ১৯৭৯ সনে হাসপাতালটি সোহরাওর্দী হাসপাতাল প্রাঙ্গন থেকে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ১৩ বিঘার বর্তমান জমিতে স্থানান্তরিত হয়। বাংলাদেশে অর্থপেডিক চিকিৎসার প্রসার এবং বহু সংখ্যক বাংলাদেশী অর্থপেডিক সার্জন কারিগর ডা: গাষ্ট। সে জন্যে তিনি বাংলাদেশে Father of Otherropedic Surgery in Bangladesh হিসেবে সমাদৃত। ২০০৯ সনের ১৫ই আগষ্ট তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পরলোক গমন করেন।

ডা: গাষ্ট অতি বিশ্বস্ত ও নিবেদিত প্রাণ সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন তখন কোলকাতায় কর্মরত দক্ষিণ ভারতীয় Sisters of Charity এর মিশনারী সিস্টার (নার্সিং ডিগ্রী প্রাপ্ত) সি: থিওডোর এমসি কে। যুদ্ধ চলাকালীন পুরোটা সময়ে ডা: গাষ্টের সাথে সীমান্তবর্তী এলাকায় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও আঘাতপ্রাপ্ত উদ্বাস্তুদের চিকিৎসা দিতেন। দেশ স্বাধীন হলে তিনি ডা: গাষ্টের সাথে ঢাকায় আসেন। সে সময় Sisters of Charity এর কার্যক্রম ঢাকায় না থাকাতে তিনি হাসপাতালের একটি কক্ষে থাকতেন। তিনি যেমন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিতেন তেমনি অর্থপেডিক নার্সিংয়ের ট্রেনিং দিতেন নার্সিং ছাত্রছাত্রীদের। তার সম্প্রদায় ঢাকায় Sisters House খুললে তিনি সেখানে থাকা শুরু করেন। একদিন হাসপাতালে আসার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালের মৃত্যু বরণ করেন।

ব্রিটিশ ফিজিওথেরাপিস্ট, সমাজকর্মী এবং সমাজসেবী ভ্যালরী অ্যান টেলর OBE বিদেশে স্বেচ্ছাসেবী সেবাকার্যক্রম VSO- Voluntary Services Overseas এর সাথে ১৫ মাসের চুক্তির অধীনে বাংলাদেশে ১৯৬৯ সনে পার্বত্য চট্টগ্রামের খ্রিষ্টান হাসপাতালে ফিজিওথেরাপিস্ট হিসাবে কাজ করার জন্য আসেন। এর মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তাঁর আর দেশে ফেরা হয় না। সে সময় তিনি চন্দ্রঘোনা খ্রীষ্টান হাসপাতালে কর্মরত ডা: সুখরঞ্জন বাড়ৈ ও মেট্রন শেফালী বিশ্বাস এর সাথে মিলে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে চিকিৎসা দিতেন। যুদ্ধ শেষে যুদ্ধাহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত জনগোষ্ঠীর কষ্ট আর দুর্দশা দেখে ইংল্যান্ডের Mandeville Hospital in Buckinghamshire এর Spinal Injury Specialist Physiotherapist ভ্যালরি টেলরের আর দেশে ফেরা হলো না। শুরুতে তিনি ডা: গাষ্টের সাথে শহীদ সোহরাওর্দী হাসপাতালের একটি পরিত্যক্ত গুদামে ৪ জন রোগী নিয়ে CRP চালাতেন যা কর্মজীবনের পরবর্তী ১০০ শয্যার হাসপাতালে অর্ন্তভূক্ত হয়। তিনি ১৯৭৯ এ পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুর্ণবাসন কেন্দ্রে CRP পরিণত হয়। ভ্যালরি টেলর, ঢাকা জেলার সাভারে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র CRP Center for Rehabilitation of Paralysed এর প্রতিষ্ঠাতা। নিজ উদ্যোগে গড়ে উঠা এ প্রতিষ্ঠানের সেবাকেন্দ্র ঢাকার মিরপুরসহ আরো কয়েকটি জেলায় সম্প্রসারিত। ইংল্যান্ডের রাণী ১৯৯৫ সনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মানসূচক পদক Officer of the most Excellent Order of the British Empire (OBE) এবং ২০০৪ সনে বাংলাদেশ সরকার তাকে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করে। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষের প্রতি তার আন্তরিকতা, ভালবাসা ও সেবার জন্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সনে তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিয়ে সম্মানিত করে। তিনি অনেকের কাছে Mother Teresa of Bangladesh, হিসেবেও পরিচিত।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, শরণার্থী শিবির, বীরাঙ্গনা মা, যুদ্ধশিশু এবং মাদার তেরেজার সম্প্রদায়: ১৯৭১ সনের ২২ শে ডিসেম্বর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে মাদার তেরেজার সিস্টারদের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের সময় পার্শ্ববর্তী শরণার্থী শিবিরগুলোতে বাংলাদেশের কোটি কোটি গৃহহারা বিপন্ন মানবতাকে মাদার তেরেজার সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ (যার মধ্যে মাদারের প্রথম দলের একজন ডাক্তার সিস্টার গেটরুট) অনলস সেবা প্রদানে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন। ১৯৭২ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তৎকালীন কাথলিক মণ্ডলী প্রধান স্বর্গীয় আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সিএসসি'র আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মাদার তেরেজা তার একদল সিস্টার নিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকার যুদ্ধাহত মা ও যুদ্ধশিশুদের ত্রাণ ও পুর্ণবাসনের কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে ঘোড়াশাল, নরসিংদী, মধ্যম গ্রাম, নারায়নগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় তা সম্প্রসারিত হয়। একই বছর ঢাকার ইসলামপুরে আমপট্টি সিস্টারদের পুরাতন আশ্রম ভবনে স্থাপন করা হয় শিশু ভবন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে হানাদার পাক বাহিনী ও তাদের দেশীয় দোসর রাজাকার আলবদর বাহিনীর হাতে লক্ষ লক্ষ মা বোনেরা নির্যাতিত ও ধর্ষিত হয়। যুদ্ধ শেষে এ সকল নির্যাতিতরা ফিরে এলে পারিবারিক এবং সামাজিক ভাবে হয় নিগৃহীত ও পরিত্যক্ত। অনেক পিতা তার কন্যা সন্তানকে অস্বীকার করাতে এরা পিতৃ পরিচয় হারা হয়ে নিজেরাও লজ্জায় পিতার নাম উচ্চারণে হয়ে পড়ে অনাগ্রহী। পুনর্বাসন কর্মীরা এদের নথিভুক্ত করাকালে অসুবিধায় পড়লে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ঘোষণা দেন, পিতার নাম লিখে দাও আমার নাম, শেখ মুজিবুর রহমান। সামাজিকভাবে পরিত্যক্তদের সম্মান প্রতিষ্ঠায় তাদেরকে আখ্যায়িত করেন বীরাঙ্গনা রূপে। এতো কিছুর পরেও অনাগত যুদ্ধ শিশুদের সমাজ ও দেশ গ্রহণে অনাগ্রহী হলে লক্ষ লক্ষ গর্ভপাত ঘটানো হয় সারা বাংলায়।

গর্ভপাত কে পাপ এবং একে গর্ভাবস্থায় হত্যা বলে অভিহিত করে মাদার তেরেজার আহ্বান ছিল, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ধনী-গরীব, দুঃখী-দরিদ্র কিছু যায় আসে না। প্রতিটা মানব সন্তান সৃষ্টিকর্তার নিজ হাতে নিজের সাদৃশ্যে তৈরী করা। প্রতিটি শিশু ভূমিষ্ট হয় নির্মল নিষ্পাপ ফুলের মত। অনাকাঙ্খিত হোক কিংবা পরিত্যক্ত হোক- সবাই সৃষ্টিকর্তারই প্রতিচ্ছবি। তাই মাদার ঢাকার ইসলামপুরে খুলেন তাঁর শিশু ভবন যেখানে এ সব মায়েদের নিরাপদ প্রসব শেষে নিষ্পাপ শিশুদের মাতৃস্নেহে লালন করে দেশীয় আইন ও বিধি মেনে বিভিন্ন দেশে দত্তক দিয়েছেন।

চার্চ অব বাংলাদেশের ডা: মালাকার এবং ডা: মণিকা মালাকার রাজশাহী অঞ্চলে এবং প্রেসবেরিটান চার্চের ডা: সজল দেওয়ান সিলেট অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাস্থ্যসেবা দিতেন। স্বাধীনতার পর পরই নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের দুর্গম এলাকায় CCDB স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে বিদেশী মিশনারী Dr. Macward চিকিৎসা সেবা দান করেন। পরে কেন্দ্রটি সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। চার্চ অব বাংলাদেশের ডা: মালাকার এবং মনিকা মালাকার রাজশাহী অঞ্চলে এবং প্রেসবেটেরিয়ান চার্চের ডা: সজল দেওয়ান সিলেট অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাস্থ্যসেবা দিতেন।

SMRA সম্প্রদায়ের অনেক সিস্টারগণ বিভিন্ন হাসপাতালে ধাত্রীবিদ্যা- বিশেষতঃ নিরাপদ ডেলিভারী ও সাধারণ রোগের চিকিৎসা বিষয়ক সীমিত সময়ের নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে বাংলাদেশের অনেকগুলো ধর্মপল্লীতে সীমিত আকারে স্বাস্থ্যসেবা দিত। মুক্তিযুদ্ধের সময়েই প্রায় ক্ষেত্রেই মুক্তিযোদ্ধাদের আশা ও ভরসাস্থল ছিল SMRA সিস্টারদের পরিচালিত এসব ছোট ছোট ক্লিনিকগুলো। এ সম্প্রদায়েরই ব্রতধারিনী সি. নিবেদিতা SMRA (পরবর্তীতে ডাক্তার) আহতদের চিকিৎসা দিয়েছেন শিশু হাসপাতালে কাজ করার ফাকে ফাকে। তুইতালের সি. ইমেল্ডা SMRA ফরিদপুর নার্সিং হোম ক্লিনিকে কাজ করার সময় অনেক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দানে সাহায্য করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এবং পরবর্তীতে Sister of Charity সম্প্রদায়ের সিঃ খ্রীষ্টিনা, সিঃ গাব্রিয়েল, সিঃ মাইকেল দিনাজপুর সদর হাসপাতালে ও সিঃ মেরীলিন, দিনাজপুরের কসবা মিশন হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধে আহতসহ শরণার্থীদের চিকিৎসা দিয়েছেন। সিঃ রোজারিয়া, SC যশোহর শিমুলিয়া মিশনের ডিসপেনসারীতে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। সিঃ উর্থুলিয়া এসসি যশোহর ফাতিমা হাসপাতালে সেবা দিয়েছেন।

ফাদার বনলো, পিমে দিনাজপুর কসবা মিশনে কয়েক হাজার শরণার্থীদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। ব্রাদার বুখারী যশোহর ফাতিমা হাসপাতালে যুদ্ধাহতদের সেবা দিয়েছেন। যশোহরের শিমুলিয়ায় মিশনের জাভেরিয়ান ফাদার ভালেরিয়ানো কক্কো, ফাদার সিলভানো সাল্ভেত্তি, এবং ব্রাদার (পরবর্তীতে ফাদার) রশিু মিশনে স্থাপিত বিরাট একটি ধানের গুদাম ঘরে হাজার

ডা: বার্নার্ড রোজারিও ও নীনা রোজারিও

হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের যারা ভারতে ট্রেনিং নেবার পরে দেশে এসে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তাদেরও তাদের অস্ত্র, গোলা-বারুদ লুকিয়ে রেখেছিলেন ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে চিকিৎসা সেবা দিতেন। একই সাথে তাদেরকে আশ্রয় খাদ্য ও অন্যান্য সেবা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। ফাদার ভালেরিয়ানো কক্কো ও ব্রাদার রশিু ভারত থেকে যশোহরের বেনাপোল হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশে প্রবেশের পর শিমুলিয়া আসার পর সার্বিক সহযোগিতা করেছেন- আশ্রয়, খাবার, চিকিৎসা এবং আর্থিক সাহায্য দিয়ে।

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই তেরেজা রিবেরু তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট Cobined Military Hospital নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৯ সনে ডিউটি কালে দেখেন শেখ মুজিবের সাথে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ২ জন বন্দী আসামী (?) কে গুরুতর জখমসহ CMH এ ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে বিমান বাহিনীর সার্জেন্ট জহিরুল হকের প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তার রক্তের গ্রুপ ছিল- AB- Negative। রক্ত ক্ষরণে ১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি তার চোখের সামনেই মারা যান। ২৫শে মার্চের হত্যালীলার পরে তার স্বামী মোটর সাইকেলে জগন্নাথ হল ও শাখারী বাজারে ঘুরতে গিয়ে হত-বিহ্বল হয়ে ৩ দিনের কার্য্য শেষের দিনই স্ত্রী-শিশু সন্তানসহ নাগরীর উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সপ্তাহ খানেক পরে কাজে যোগদানের কড়া হুশিয়ারী শুনে কাজে যোগ দেন। মাসখানেক পরে শিশু বাচ্চার কারণ দেখিয়ে কাজে

ঘোষণা দেন, পিতার নাম লিখে দাও আমার নাম, শেখ মুজিবুর রহমান। সামাজিকভাবে পরিত্যক্তদের সম্মান প্রতিষ্ঠায় তাদেরকে আখ্যায়িত করেন বীরাঙ্গনা রূপে। এতো কিছুর পরেও অনাগত যুদ্ধ শিশুদের সমাজ ও দেশ গ্রহণে অনাগ্রহী হলে লক্ষ লক্ষ গর্ভপাত ঘটানো হয় সারা বাংলায়।

গর্ভপাত কে পাপ এবং একে গর্ভাবস্থায় হত্যা বলে অভিহিত করে মাদার তেরেজার আহ্বান ছিল, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ধনী-গরীব, দুখী-দরিদ্র কিছু যায় আসে না। প্রতিটা মানব সন্তান সৃষ্টিকর্তার নিজ হাতে নিজের সাদৃশ্যে তৈরী করা। প্রতিটি শিশু ভূমিষ্ট হয় নির্মল নিষ্পাপ ফুলের মত। অনাকাঙ্খিত হোক কিংবা পরিত্যক্ত হোক- সবাই সৃষ্টিকর্তারই প্রতিচ্ছবি। তাই মাদার ঢাকার ইসলামপুরে খুলেন তাঁর শিশু ভবন যেখানে এ সব মায়েদের নিরাপদ প্রসব শেষে নিষ্পাপ শিশুদের মাতৃস্নেহে লালন করে দেশীয় আইন ও বিধি মেনে বিভিন্ন দেশে দত্তক দিয়েছেন।

চার্চ অব বাংলাদেশের ডা: মালাকার এবং ডা: মণিকা মালাকার রাজশাহী অঞ্চলে এবং প্রেসবেরিটান চার্চের ডা: সজল দেওয়ান সিলেট অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাস্থ্যসেবা দিতেন। স্বাধীনতার পর পরই নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের দুর্গম এলাকায় CCDB স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে বিদেশী মিশনারী Dr. Macward চিকিৎসা সেবা দান করেন। পরে কেন্দ্রটি সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। চার্চ অব বাংলাদেশের ডা: মালাকার এবং মনিকা মালাকার রাজশাহী অঞ্চলে এবং প্রেসবেটেরিয়ান চার্চের ডা: সজল দেওয়ান সিলেট অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাস্থ্যসেবা দিতেন।

SMRA সম্প্রদায়ের অনেক সিস্টারগণ বিভিন্ন হাসপাতালে ধাত্রীবিদ্যা- বিশেষত: নিরাপদ ডেলিভারী ও সাধারণ রোগের চিকিৎসা বিষয়ক সীমিত সময়ের নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে বাংলাদেশের অনেকগুলো ধর্মপল্লীতে সীমিত আকারে স্বাস্থ্যসেবা দিত। মুক্তিযুদ্ধের সময়েই প্রায় ক্ষেত্রেই মুক্তিযোদ্ধাদের আশা ও ভরসাস্থল ছিল SMRA সিস্টারদের পরিচালিত এসব ছোট ছোট ক্লিনিকগুলো। এ সম্প্রদায়েরই ব্রতধারিনী সি. নিবেদিতা SMRA (পরবর্তীতে ডাক্তার) আহতদের চিকিৎসা দিয়েছেন শিশু হাসপাতালে কাজ করার ফাকে ফাকে। তুইতালের সি. ইমেল্ডা SMRA ফরিদপুর নার্সিং হোম ক্লিনিকে কাজ করার সময় অনেক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দানে সাহায্য করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এবং পরবর্তীতে Sister of Charity সম্প্রদায়ের সিঃ খ্রীষ্টিনা, সিঃ গাব্রিয়েল, সিঃ মাইকেল দিনাজপুর সদর হাসপাতালে ও সিঃ মেরীলিন, দিনাজপুরের কসবা মিশন হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধে আহতসহ শরণার্থীদের চিকিৎসা দিয়েছেন। সিঃ রোজারিয়া, SC যশোহর শিমুলিয়া মিশনের ডিসপেনসারীতে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। সিঃ উর্থুলিয়া এসসি যশোহর ফাতিমা হাসপাতালে সেবা দিয়েছেন।

ফাদার বললো, গিয়ে দিনাজপুর কসবা মিশনে কয়েক হাজার শরণার্থীদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। ব্রাদার বুখারী যশোহর ফাতিমা হাসপাতালে যুদ্ধাহতদের সেবা দিয়েছেন। যশোহরের শিমুলিয়ায় মিশনের জাভেরিয়ান ফাদার ভালেরিয়ানো কক্কো, ফাদার সিলভানো সালভেত্তি, এবং ব্রাদার (পরবর্তীতে ফাদার) রশিদ্ম মিশনে স্থাপিত বিরাট একটি ধানের গুদাম ঘরে হাজার

ডা: বার্নাড রোজারিও ও লীনা রোজারিও

হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের যারা ভারতে ট্রেনিং নেবার পরে দেশে এসে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তাদেরও তাদের অস্ত্র, গোলা-বারুদ লুকিয়ে রেখেছিলেন ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে চিকিৎসা সেবা দিতেন। একই সাথে তাদেরকে আশ্রয় খাদ্য ও অন্যান্য সেবা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। ফাদার ভালেরিয়ানো কক্কো ও ব্রাদার রশিদ্ম ভারত থেকে যশোহরের বেনাপোল হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশে প্রবেশের পর শিমুলিয়া আসার পর সার্বিক সহযোগিতা করেছেন- আশ্রয়, খাবার, চিকিৎসা এবং আর্থিক সাহায্য দিয়ে।

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই তেরেজা রিবেরু তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট Cobined Military Hospital নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৯ সনে ডিউটি কালে দেখেন শেখ মুজিবের সাথে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ২ জন বন্দী আসামী (?) কে গুরুতর জখমসহ CMH এ ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে বিমান বাহিনীর সার্জেন্ট জহিরুল হকের প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তার রক্তের গ্রুপ ছিল- AB- Negative। রক্ত ক্ষরণে ১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি তার চোখের সামনেই মারা যান। ২৫শে মার্চের হত্যালীলার পরে তার স্বামী মোটর সাইকেলে জগন্নাথ হল ও শাখারী বাজারে ঘুরতে গিয়ে হত-বিহ্বল হয়ে ৩ দিনের কার্ফু শেষের দিনই স্ত্রী-শিশু সন্তানসহ নাগরীর উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সপ্তাহ খানেক পরে কাজে যোগদানের কড়া হুশিয়ারী শুনে কাজে যোগ দেন। মাসখানেক পরে শিশু বাচ্চার কারণ দেখিয়ে কাজে

ইস্তফা দেন। ৭১ সনের মাকামাঝি হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের মিশনারী সিস্টারদের অনুরোধে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে যোগ দেন। সে সময় ডাক্তার ও নার্সদের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। সে সময় প্রায় সব নার্সই ছিল খ্রীষ্টান। সে সময় কিছু ফিলিপিনস নার্সও কাজ করেছে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের খুবই সতর্কতার সাথে বিশেষ গোপনীয় স্থানে রেখে চিকিৎসা দেয়া হত।

ধর্মীয় বিশ্বাসগত হিসেবে আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যার মাত্র ০.০৩%। আমাদের সংখ্যার অনুপাতে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অংশগ্রহণ ও অবদান শতক গুণ। আমরা অবিবেচকের মত যুদ্ধ শেষের প্রাপ্য দাবী করছি না। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রীষ্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙ্গালী এ শ্লোগানে ও লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এবং আমাদের সবার ত্যাগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের আহ্বানে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ সম্মিলিত জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত। তাই আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বর্ষে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট দাবী জানাই কিংবদন্তী সুরকার, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠ শিল্পী ব্রিগেড প্রধান সমর দাসকে ওয়ারী কবরস্থান থেকে বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে স্থানান্তর করা হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারেঃ

১। ডেভিড আশীষ পাণ্ডে, মেরীল্যান্ড
২। রোজলীন কস্তা, নিউইয়র্ক
৩। পল পরী রোজারিও, মেরীল্যান্ড
৪। লীনা রোজারিও, জয়দেপুর
৫। নীহার আন্না গমেজ, কানেক্টিকা
৬। ডঃ ইসিদোর গমেজ, ঢাকা

(লেখক: বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের প্রাক্তন মহাসচিব, সুহৃদ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, খ্রিস্টান ছাত্রকল্যাণ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষা সম্পাদক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদেও প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসী।)

Source: **Holy Family Hospital Dhaka doctors list Archives - Doctor Guide Online**

মূলত পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, বারাসাত, বনগাঁ, দমদম ও সল্টলেক– প্রভৃতি এলাকায় নিজের চোখে শরনার্থী শিবিরের ভয়াবহ অবস্থা দেখেন। মূলত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে বিপন্ন শরনার্থীদের মধ্যে সেবার কাজ করার মাধ্যমে মাদার তেরেজা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। তিনি সম্পূর্ণ নিজের তাগিদেই তাদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক কিছু সাহায্য-সংস্থার সহায়তায় তিনি শরনার্থী শিবিরগুলোতে জরুরিভিত্তিতে ঔষধ, খাদ্য ও কাপড়ের জোগান দিতে শুরু করেন। কলকাতার বস্তি থেকে তাঁর দৃষ্টি চলে যায় দেশত্যাগী লক্ষ লক্ষ মানুষের দিকে; যাদের আশ্রয় ছিল না, যাবার কোনো জায়গা ছিল না। তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল অন্তঃকরণে শরনার্থী শিবিরে প্রত্যেকের কাছে যেতেন। নিচু হয়ে তাদের প্লাস্টিকের ছাউনিতে প্রবেশ করতেন। তাদের স্পর্শ করে ব্যথা-যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করতেন। খুব মনযোগ দিয়ে তাদের সবার কথা শুনতেন। মাদার তেরেজা বাংলাভাষায় বেশ পারদর্শী ছিলেন। সেই শরনার্থী শিবিরের সুবিধা-বঞ্চিত মানুষেরা এটুকু বুঝতে

পারত যে, এই ক্ষুদ্রাকৃতির নারীর হৃদয় বিশাল ও বিশ্বমাতৃত্বের প্রেমে কানায় কানায় পূর্ণ। সেখানে ভালোবাসার কোনো সীমা নেই, কমতি নেই, ক্ষয় নেই, লয় নেই। তিনি সত্যিকারের একজন মা। সন্তানদের দুঃখকষ্টে তিনি কাতর হন।

মুক্তিযুদ্ধকালে ভারত সরকার বিদেশীদের ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার এলাকা পরিদর্শনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তবে মাদার তেরেজা যেন সমস্ত নিয়ম-কানুন ও বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে। তিনি প্রতিদিনই তাঁর সিস্টারদের নিয়ে উদ্বাস্তুক্যাম্প পরিদর্শনে যেতেন। সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন খাবার ও ঔষধ। বলতে গেলে তিনিই প্রথম বাংলাদেশি শরনার্থীদের সেবা-সহায়তায় এগিয়ে আসেন। বাংলাদেশের যুদ্ধবিপর্যস্ত জনগণের জন্য মাদার তেরেজার সঙ্গে একযোগে কাজ করেন তৎকালীন অক্সফাম কর্ণধার জুলিয়ান ফ্রান্সিস। তিনি মাত্র ২৩ বছর বয়সে মাদারের সান্নিধ্যে আসেন। শরনার্থী শিবিরে কাজ করার অভিজ্ঞতায় মাদারকে তিনি "আশ্চর্য সংবেদনশীল মানবপ্রেমী এক জননী" বলে অভিহিত করেন। মাদার এবং তাঁর কয়েকজন সিস্টারের সঙ্গে তিনি প্রত্যহ বিভিন্ন উদ্বাস্তু-শিবির পরিদর্শনে যেতেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী: "প্রতিদিন সকাল ৬:৪৫ মিনিটে মাদার আমাকে ফোন করে 'শুভ সকাল' না বলে বলতেন 'ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন জুলিয়ান'। তারপরই শরনার্থীদের জন্য সেইদিন কী কী জিনিসপত্র দরকার তার একটি তালিকা জানিয়ে দিতেন। সেগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই ছিল ঔষধ, ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, এবং শিশুদের জন্য প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার। মাদারের সিসটারগণ চিকিৎসাসেবায় বেশ দক্ষ ছিলেন। শরনার্থী শিবিরে গিয়েই মাদার মা ও শিশুদের খোঁজখবর নিতে শুরু করতেন। আগের দিনে কার কী সমস্যার কথা শুনেছেন, সবই তাঁর স্মরণে থাকত। সে বিষয়ে তিনি জানতে চাইতেন। তাঁর সিস্টারগণ অসুস্থ নারী ও শিশুদের ঔষধ-পথ্য বিলি করতেন। মাদার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেসবের তদারকি করতেন। সেইসঙ্গে প্রতিদিনই কলকাতা থেকে শরনার্থী শিবিরে তাঁদের যাতায়াতের জন্য গাড়ি বা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করতে বলতেন। জুন মাসের এক দুপুরে লণ্ডন থেকে শরনার্থীদের অক্সফামের বেশকিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দমদম বিমানবন্দরের শুল্কদপ্তরের কর্মচারীগণ খালাস করতে দিচ্ছিল না। তাতে আমার বেশ রাগ হয়। আমি শুল্ক-কর্মকর্তাদের সঙ্গে জোর গলায় কথা বলছি। হঠাৎ আমার কাঁধে এক কোমল হাতের স্পর্শ। আমি ফিরে দেখি মাদার দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে বললেন, 'জুলিয়ান এইসময় মাথা গরম করে কোনো লাভ নেই। চলো আমরা বরং প্রার্থনা করি। ঈশ্বর সব সমস্যার সমাধান করবেন।' বলেই তিনি লাতিন ভাষায় প্রভুযিশুর প্রার্থনা শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর অফিসারদের সঙ্গে মিনিট দুয়েক কথা বললেন। তারপরই দেখলাম আমাদের জিনিসপত্র লালফিতার বেষ্টনি পেরিয়ে বাইরে এলো। আমি তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়।" ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার জুলিয়ান ফ্রান্সিসকে 'মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম বন্ধু' বলে স্বীকৃতি দেয়।

বাংলাদেশি শরনার্থীশিবিরে কাজের জন্য মাদার তেরেজা কলকাতার জেজুইট ফাদারদের সহায়তা চাইলে ফাদারগণ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রম ও বিভিন্ন সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেইসঙ্গে ভারতের বিভিন্ন গঠনগৃহ থেকেও যুবক যিশুসঙ্গীরা এক-কাতারে উদ্বাস্তুশিবিরে এক বছর ধরে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে মাদারকে সাহায্য করেন। কলকাতা যিশু সংঘ প্রদেশের ফাদার জেরার্ড বেকার্স এস. জে. সেই কাজের সমন্বয়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সহকারী ফাদার প্যাট্রিক ইটেন এস. জে. একবার বলেছেন, এসব যুবক এবং কর্মকুশলী স্বেচ্ছাসেবকেরা শরনার্থী শিবিরে নতুন প্রাণের জোয়ার আনে। তারা শিশুদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা ছাড়াও প্রতি সপ্তাহে গান-বাজনাসহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তারা প্রতিদিন উদ্বাস্তু শিবিরের আশেপাশে পয়-পরিষ্কার করত। লোকদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণেও সহায়তা করত।

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন: মাদার তেরেজা সবসময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘোরবিরোধী ছিলেন। তিনি জোরালোভাবে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত

করতেন। এমনকি প্রতিবাদও জানাতেন। তিনি জানতেন যে, প্রাণবিনাশক কোনো পন্থাই মানুষের কল্যাণ করতে পারে না। উপরন্তু সেটা জনসাধারণের জীবন দুর্বিষহ করে। অতএব একাত্তরের যুদ্ধে বাঙালির নারকীয়, বীভৎস ও মানবেতর জীবন-যাপন দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। পৃথিবীর বড় বড় নেতাদের নীরবতার তীব্র নিন্দা জানান। অচিরেই তিনি বাঙালির এই ঘোরতর দুর্দশায় বিশ্ববিবেক জাগ্রত করার প্রচেষ্টায় সামিল হন। তাঁদের প্রতি জোরালো দাবি জানান, যাতে তাঁরা বিপন্ন মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। কিভাবে আধুনিক সভ্যতার যুগে এসেও একদল মানুষ নিজেদের স্বার্থের জন্য আরেকদল মানুষের প্রতি এমন নির্মম, পাশবিক ও হিংস্র আচরণ করতে পারে– সেই বিষয়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যাটি কিভাবে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই ভাবনা থেকে যাঁরা সরাসরি এই শরনার্থী শিবিরের মর্মন্তুদ অবস্থার স্বাক্ষী, তাঁদের মধ্যে থেকে নামকরা ও প্রভাবশালী ৬০ জন মানুষের সাক্ষ্য নিয়ে ২১ অক্টোবর ১৯৭১ সালে অক্সফাম প্রকাশ করে 'দ্য টেস্টিমনি অফ সিক্সটি অন দ্য ক্রাইসিস ইন বেঙ্গল ১৯৭১'। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুরতা ও শরনার্থী শিবিরের করুণ দুর্ভোগের চিত্র ফুটে উঠেছিল অক্সফামের সেই মানবতার দলিলে। সেখানে মাদার

তেরেজা লিখেছেন, "আসুন আমরা এই সত্য সবসময় স্মরণ রাখি যে, বাংলাদেশের মানুষ, পাকিস্তানের মানুষ, ভারতের মানুষ, ভিয়েতনামের মানুষ; যেখানকার মানুষই হোক না কেন, সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। সবাই তাঁরই পরিকল্পনায় সৃষ্ট। বাংলাদেশের বিপন্ন মানুষদের নিয়ে এই সমস্যা শুধু ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীরই সমস্যা এটা। তাই এর দায়ভার গোটা পৃথিবীকেই বহন করতে হবে।" তিনি আরও লিখেছেন, "আমি পাঁচ-ছয় মাস ধরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরনার্থীদের মধ্যে কাজ করছি। এখানে প্রতিদিন অনেক শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষদের মরতে দেখছি। সেই কারণেই আমি পৃথিবীর মানুষকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এখানে পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। অতএব জরুরিভিত্তিতে এই মানুষদের জন্য সাহায্য দরকার। প্রচুর পরিমাণে সাহায্যের প্রয়োজন। সারা পৃথিবীর কাছে আমার এই আকুল আবেদন। সমগ্র পৃথিবীকে অবশ্যই সাড়া দিতে হবে।" এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মাদারের এমন জোরালো আহ্বানে পৃথিবী সত্যিই সাড়া দিয়েছিল।

যুদ্ধবিপর্যস্ত বাংলাদেশ থেকে এককোটি শরনার্থীর ধাক্কায় ভারত-সরকার দিশেহারা হয়ে পড়ে। সেই সময় অর্থের চেয়েও বেশি প্রয়োজন ছিল পাশে থাকার আশ্বাস। বাঙালির এতো বড় বিপর্যয় আর এর ভয়াবহতা মাদার উপলব্ধি করতে পারলেন। শুধু ভারতের একার পক্ষে সেই দায় বহন করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি কখনও কারও নামে বিষোদ্‌গার করতেন না। মানুষের সমালোচনাও করতেন না। তবে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির বিপর্যয়ের কথা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরলেন। সত্যপ্রকাশে তিনি ছিলেন কুণ্ঠাহীন। ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশীদের শিবিরে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মাদার তেরেজা বলেন, "এখানকার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ভাষায় প্রকাশ করা খুবই কষ্টসাধ্য। নিজের চোখে না দেখলে কেউই এই ভয়াবহ পরিস্থিতি বুঝতে পারবে না। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, ভারত সরকার বাংলাদেশী জনগণকে যথাযোগ্য মর্যাদায় গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের মানুষের প্রতি ভারতের ভালোবাসা অভাবনীয়। আমি দীর্ঘদিন ধরে ভারতে আছি, তবে উদারতার এমন উদাহরণ আগে কখনও দেখিনি। এখন আমি সেটা দেখছি। উপলব্ধি করছি। ভারতীয়রা আন্তরিকভাবেই সঙ্কটাপন্ন মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সেবা করছে। ভবিষ্যতে আরও সুন্দর এবং মহৎ কিছু ঘটবে বলে আমি আশাবাদী।"

১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময়ে শরনার্থী শিবিরগুলোতে কনজানঙ্কভাইটিস রোগ প্রকট আকার ধারণ করে। ইতিপূর্বে এই রোগ পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়নি। তাই প্রথমবারের ধাক্কায় শরনার্থীদের ও স্থানীয় মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। বাংলাদেশে 'চোখ ওঠা' বলে পরিচিত উপসর্গ উদ্বাস্তুদের মাধ্যমে ছড়িয়েছিল বলে সেইরোগ কলকাতায় 'জয়বাংলা' নামে পরিচিতি পায়। শরনার্থী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে পরবর্তী উৎপাত হিসাবে জুলাই-আগস্ট মাসে কলেরার তীব্র প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। সেই সময় ডায়েরিয়া ও কলেরায় আকান্ত হয়ে বহু শরনার্থী মারা যায়। মাদার তেরেজা ও তাঁর সিস্টারগণ ক্লান্তিহীনভাবে আক্রান্ত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। মানুষের চাহিদার সবদিকেই তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। সেই বছর বর্ষাকালে মানুষের দুর্ভোগ আরও বেড়ে যায়। তাদের আবাসগৃহ নির্মাণে মাদারের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। আবার নভেম্বর মাসে শীতের আবির্ভাবে তিনি শীতার্ত মানুষের জন্য গরম কাপড় এবং কম্বল জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি করেন যাতে ঈশ্বরের কোনো সন্তান শীতে কষ্ট না পায়। তিনি জানতেন তাঁর একার পক্ষে সব মানুষের পাশে দাঁড়ানো সম্ভব নয়; কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ছিল বেশি মানুষের দুর্দশা লাঘব করা। তারপরও অনেক দুর্বল শিশু ও রোগাক্রান্ত মা মাদারের সামনেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। প্রায় এক বছরে বাংলাদেশি শরনার্থী-শিবিরগুলোতে ৮ লাখেরও বেশি শিশু পুষ্টিহীনতায় মারা যায়।

১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর মাদার তেরেজাকে শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার দেবার সময় নোবেল কমিটি বলেছিল: "মাদার তেরেজাকে নোবেল শান্তি-পুরষ্কার দেবার মাধ্যমে কমিটি তাঁর মানবতাবাদী কাজ দিয়ে তিনি পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের জন্য যে শুভকর্ম করছেন, সেই সত্যকেই গভীরভাবে গ্রহণ করছে। এই আমরা পৃথিবীতে শিশুদের দূরাবস্থা ও শরনার্থীদের দুর্দশার দিকে সহৃদয় দৃষ্টি দেবার প্রচেষ্টায় বদ্ধপরিকর। আর এই বিপন্ন মানুষের জীবন্নোয়নের জন্যই বিগত বছরগুলোতে মাদার তেরেজা নিঃস্বার্থভাবে তাঁর কাজ চালিয়ে গেছেন।"

স্বাধীন বাংলাদেশে মাদার তেরেজার কাজকর্ম: ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পরই ঢাকার আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলি এবং খুলনার বিশপ মাইকেল অতুল ডি'রোজারিও মাদার তেরেজাকে বাংলাদেশে তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রসারের আবেদন জানান। তাৎক্ষণিকভাবে বিশপদের সেই প্রস্তাবে তিনি রাজি হন। তবে তিনি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ আশা করেছিলেন। সেই সুবাদে বিজয়ের পরই, অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে এক চিঠিতে মাদার তেরেজা বাংলাদেশে সেবার কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর আগ্রহ ছিল বিশেষত যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন করা এবং যুদ্ধশিশুদের যত্ন নেওয়া। রাষ্ট্রপতি সঙ্গে সঙ্গে মাদারের কথায় সম্মত হন। সেই কথামতো ১৯৭১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে মাদার তেরেজা মুক্তিযুদ্ধে লাঞ্ছিত নারী ও যুদ্ধশিশুদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বগ্রহণপূর্বক এক চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে ১৯৭১ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফেরার পর বিভিন্ন মানুষের কাছে বাংলাদেশি শরনার্থী-শিবিরে মাদার তেরেজার সেবার কাজ সম্বন্ধে জানতে পারেন। বিশেষত অক্সফাম কর্ণধার জুলিয়ান ফ্রান্সিস বিস্তারিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিযুদ্ধে মাদারের সহায়তা ও জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানান। তাই তিনি যখন জানতে পারেন যে, মাদার বাংলাদেশে কাজ করতে আগ্রহী, তিনি সানন্দে রাজি হয়ে যান।

তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ১৪ই জানুয়ারি মাদার তেরেজার সঙ্গে ১০ জন সিস্টার নিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে সেবার কাজে আসার ঘোষণা দেন। তার এক সপ্তাহের মধ্যেই ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারি মাদার এবং তাঁর সিস্টারগণ ঢাকার ইসলামপুরে একটি গৃহে তাঁদের কর্মযজ্ঞ শুরু করেন। প্রথমে তাঁরা ইসলামপুর এলাকায় ৫টি বাসা ভাড়া করে আশ্রয়কেন্দ্র খুলেছিলেন। খুব শীঘ্রই নিজেদের জন্য বরাদ্দকৃত বাড়িটির নাম দেন 'শিশু ভবন'। এই শিশুভবনই বাংলাদেশে মাদার ও তাঁর ধর্মসংঘের প্রথম গৃহ। পরবর্তীতে এই বাড়ি থেকেই আস্তে আস্তে তাঁদের কর্মপরিধি সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তবে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরা খুলনায় তাঁদের কেন্দ্র চালু করেন। অবশ্য মাদারের বাংলাদেশে আগমনের ব্যাপারে সর্বপ্রথম আগ্রহ দেখান খুলনার বিশপ মাইকেল অতুল ডি'রোজারিও।

বীরাঙ্গনা নারীদের নিরাপত্তাদান ও পুনর্বাসন : ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় লাভ করলেও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সামনে তখন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যত। বিজয়ের আনন্দ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের জন্ম দেয়। নতুন দেশ গড়ার সাধ থাকলেও মানুষের সাধ্য ছিল কম। মুক্তিযুদ্ধের পর শরনার্থী ও অবকাঠামোগত সমস্যার পাশাপাশি বড় অস্বস্তিকর ছিল বীরাঙ্গনা সমস্যা। এই সমস্যাটি নিয়ে তখন সবার অবস্থা যেন তথৈবচ। তাই নির্যাতিত মা-বোনদের জন্য আত্মহত্যা কিংবা নিঃশেষ হয়ে যাওয়াটাই যেন ছিল মঙ্গলকর ভবিতব্য। সেই ক্রান্তিকালীন সমস্যা সমাধানের দূত হয়ে এসেছিলেন মমতাময়ী মা তেরেজা। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় তিন লক্ষ মা-বোন পাকিস্তানি সৈন্য এবং এদেশে তাদের দোসরদের দ্বারা যৌন-সহিংসতার শিকার হয়। তাদের অনেকেই শারীরিক যন্ত্রণা লাঘবের লক্ষে এবং অপবাদ থেকে উদ্ধারের আশায় গর্ভপাত করেছে। তবে কয়েকজন সেই পথে যায়নি। শিশুভবনের তত্ত্বাবধায়ক সিস্টার বলেছেন, "গর্ভবতী নারীদের রাতের আঁধারে আমাদের কাছে আনা হতো, যাতে কেউ তাদের চিনতে না পারে। তাদের অনেকেই গর্ভপাতের আশা নিয়েই আমাদের বাড়িতে আসত। কিন্তু আমাদের সিস্টারগণ তাদের বোঝাতেন যে, কোনো মায়েরই তার গর্ভের শিশুকে হত্যা করা ঠিক নয়। অনাকাঙ্ক্ষিত শিশুদের গ্রহণ করার ও দায়িত্ব নেবার জন্য কোনো না কোনো মানুষ

পাওয়া যাবেই। সেইসব নারীদের সময় নিয়ে পরামর্শ দেবার পরই তাঁরা সন্তান জন্ম দিতে সম্মত হতো। আর মাদার কখনোই চাইতেন না কোনো মা তার গর্ভের শিশুর ক্ষতি করুক। তিনি মনে করতেন, ঈশ্বর সব শিশুকেই এই পৃথিবীর মুখ দেখার এবং বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছেন।" বেশির ভাগ মায়েরাই তাদের সন্তানদের ঝামেলা হিসাবেই দেখত। তারা তাদের গ্রহণ করতে ও দায়িত্ব নিতে আগ্রহী ছিল না। কয়েকজন মা তাদের সন্তানদের একবার দেখেই যে চলে যেত, আর কখনও ফিরে আসত না।

অধিকাংশ নারীই পাকিস্তানিদের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়াকে লজ্জাজনক এবং অপমানকর মনে করত। অথচ এমন অমানবিক ঘটনায় নিজেদের কোনো দোষ ছিল না। তবে সাধারণ মানুষ সেটা বুঝতে চাইত না। তাই এই গ্লানিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায় ছিল গর্ভের শিশু নষ্ট করা। যদিও সরকার এইসব নারীদের

সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক 'বীরাঙ্গনা' বলে অভিহিত করে, তবে সামাজিকভাবে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। অনেকেই তাদের ঘৃণার চোখে দেখত। তাদের অপমানজনক কথা বলত। এই পরিস্থিতিতে বীরাঙ্গনা নারী ও অবাঞ্ছিত শিশুদের সেবাযত্নে মাদার তেরেজার সিস্টারদের তুলনা মেলা ভার। তাঁরা গর্ভপাতের বিরুদ্ধে গর্ভবতী নারীদের সচেতন করতেন। পরামর্শ ও মানসিক সহযোগিতা দিয়ে বোঝাতেন যে, তাদের গর্ভে শত্রুসেনার সন্তান থাকলেও সেই শিশু তাদেরই অস্তিত্বের অংশ। সেই শিশুকে ঘৃণা বা ধ্বংস করা ঠিক নয়। কিন্তু সেই নারীরা যে শারীরিক ব্যথা ও মানসিক যন্ত্রণা পেয়েছে, সেই ক্ষত সারিয়ে তোলার মতো কোনো শক্তি ও উপায় ছিল না। দেশ স্বাধীন হবার পরও তাদের বঞ্চনার রেশ কাটেনি।

১৯৭২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন করার জন্য বিশেষ বোর্ড গঠন করা হয়। তাদের কাজ ছিল যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশের বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতিত নারীদের সাহায্য-সহযোগিতা ও চিকিৎসার জন্য পুনর্বাসনকেন্দ্র খোলা হয়েছিল। সেসব জায়গা থেকেও অনেক নারী ও শিশুদের ইসলামপুরে মাদার তেরেজার শাখায় পাঠানো হতো। আর কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত শিশুভবনটি যেহেতু মাদার তেরেজার স্থাপিত প্রথম শিশু-পরিচর্যাকেন্দ্র, তাই সেখানকার সিস্টার, সেবিকা ও কর্মীদেরও ঢাকায় এনে স্থানীয় লোকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন মাদার।

পরবর্তীকালে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির পক্ষ থেকে 'জাগরণী' নামে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্প থেকে বিধবা মেয়েদের আর্থিকভাবে সাহায্য করা হতো। সেই সহায়তায় তারা হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন করত, ফলে তাদের আয়ের পথ তৈরী হতো। এছাড়া মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সিস্টারগণ হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান ও সেলাই সেন্টারের মাধ্যমে পিছিয়ে-পড়া নারীদের দেশ ও সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

যুদ্ধশিশুদের সুরক্ষা ও দত্তক প্রদান: স্বাধীন বাংলাদেশে যুদ্ধশিশুদের নিয়ে একটা অস্বস্তি কাজ করছিল। সামাজিক নানা চাপের কথা ভেবে শুরুতে রাষ্ট্রও তেমন কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছিল না। সরকার মহলের অনেকেই যুদ্ধশিশুদের পাকসৈন্যদলের বীভৎসতার স্মারক বলে মনে করত। এমনকি কয়েকজন নীতি-নির্ধারক সেসব শিশুদের দূষিত ও অসুস্থ রক্তের স্মৃতিচিহ্ন বলে ভাবত। তাই যেসব নারীরা গর্ভপাত করেছিল, তারা মনে করেছিল পরিত্রাণ পেয়ে গেছে। তারা শত্রু-সন্তানকে লালন-পালন করতে চায়নি। আর যারা গর্ভপাতের ঝুঁকি নিতে পারেনি, তারা সবসময়ই সেই শিশুদের ঘৃণা করে গেছে। আবার যারা দত্তক প্রথার কথা বলছিল, তারা নিজেরাও কিন্তু সেসব শিশুদের গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। অন্যদিকে একটি পক্ষ থেকে যুদ্ধশিশুদের মাতৃগর্ভেই বিনাশ করার জনমত তৈরী হচ্ছিল। অথচ মাদার তেরেজা গর্ভপাতকে নরহত্যা বলেই মনে করতেন। তাঁর মতে, "প্রত্যেক মানবসন্তানই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। ঈশ্বর নিজ সাদৃশ্যে সযত্নে মানুষ সৃষ্টি করেন। মানবশিশু ভ্রূণ থেকেই নির্মল পবিত্র। তারা অনাকাঙ্খিত হলেও তাদের ধ্বংস বা পরিত্যাগ করা

কোনোভাবেই কাম্য নয়।" সত্যিই ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি যুদ্ধশিশুদের তো কোনো অপরাধ ছিল না। তাদের বিনাশ মাদার কোনোভাবেই সমর্থন করতে পারেননি। তিনি শিশুদের নিরাপদ জন্মগ্রহণের সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। তাঁর সিস্টারদের নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যাতে যুদ্ধশিশুদের মায়ের আদর-যত্ন দিয়ে লালন পালন করেন।

ইসলামপুর শিশুভবনে সিস্টারদের সহায়তা ও সেবাযত্নে নির্যাতিত অনেক নারী সেখানে সন্তান প্রসব করে। পরবর্তী সময়ে তাদের অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, সুইডেন, হল্যাণ্ডসহ– বিভিন্ন দেশের আগ্রহী পিতামাতাদের কাছে দত্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করে মিশনারিজ অফ চ্যারিটি। পরে বাংলাদেশ তাদের যুদ্ধশিশু হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। যুদ্ধশিশুদের নিয়ে গবেষণা-ভিত্তিক 'একাত্তরের যুদ্ধশিশু' গ্রন্থে সাজিদ হোসেন লিখেছেন, পাকিস্তানিদের যৌননিগ্রহের ফলে গর্ভবতী হয়ে-পড়া নারীরা যাতে গর্ভপাত না ঘটিয়ে সন্তানদের নিরাপদে এই পৃথিবীর আলো দেখাতে পারেন, তার সমস্ত আয়োজন করেছিল মাদার তেরেজার মিশনারিজ অফ চ্যারিটি। এমনকি যুদ্ধশিশুদের জন্য একটি নিরাপদ পারিবারিক প্রতিবেশ তৈরীর অঙ্গীকার করেছিলেন মাদার তেরেজা। সেই প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর।

১৯৭২ সালের ১৯ জুলাই কানাডীয় দম্পত্তি বনি কাপুচিনো এবং তাঁর স্বামী ফ্রেড কাপুচিনো ১৫ জন যুদ্ধশিশু বাংলাদেশ থেকে কানাডা নিয়ে যান। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই দম্পতি বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের বীভৎসতার খবর পান। মাদার তেরেজা নিজে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের অবাঞ্ছিত শিশুদের দত্তক নেবার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেন। মাদার তেরেজার সিস্টারদের সঙ্গে মিলে তাঁরা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বৈধ সমস্ত নিয়ম-কানুন মোতাবেক যুদ্ধশিশুদের দত্তক নেবার ব্যবস্থা করেন। বনির নিজের কথায়: "১৯৭২ সালের শুরুর দিকে আমরা মাদার তেরেজার কাছ থেকে

জানতে পারি যে, ঢাকার ইসলামপুরে পাকিস্তানি কর্তৃক বাঙালি নারীদের যৌন-নির্যাতনের ফলে অনেক অপরিপক্ক সন্তান জন্মগ্রহণ করছে। মাদার তেরেজার সিস্টারগণ তাদের পরিচর্যা করছেন। তখন মনে হলো তাদের মধ্যে থেকে কিছু শিশু কানাডায় দত্তক নিয়ে যদি তাদের ভবিষ্যত সুন্দর করতে পারি, তাহলে ভালো হয়। বাংলাদেশের শিশুদের মাধ্যমেই আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রথম যুদ্ধশিশু দত্তক নেবার প্রচলন করি।" বনি দম্পতি মাদার তেরেজার প্রেরণায় বাংলাদেশ থেকে নিজেদের জন্য একজন শিশু দত্তক নেন। এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আরও ১৮ জন শিশু তাঁরা পোষ্যসন্তান হিসাবে গ্রহণ করেন। অথচ তাঁদের নিজেদেরই দুজন সন্তান ছিল। ১৯৭৩ সালে তাঁরা ঢাকায় যুদ্ধশিশুদের যত্নের জন্য একটি নিবাস তৈরী করেন। পরবর্তী সময়ে মাদার তেরেজার আদর্শ ও পরামর্শে চট্টগ্রামে 'শিশু-স্বর্গ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

সেইন্ট মাদার তেরেজা অব কলকাতা, প্রে ফর আস্

ঢাকায় মাদার তেরেজার শিশুভবনে তখন অনেক অপরিণত শিশু ছিল। তাদের শারীরিক বিকাশ পুরোপুরি ঘটেনি। তারা আকৃতিতে ছিল খুবই ছোট। ওজনেও ছিল বেশ হালকা। তাদের উচুঁ রাখার জন্য সিস্টারগণ বিশেষ ধরণের যন্ত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। সেগুলোকে প্রাথমিক ইনকিউবিটর বলা যায়। শুধু তা-ই নয়, মুক্তিযুদ্ধে যেসব শিশু তাদের পিতামাতাকে হারিয়েছিল, তাদের একটি অংশও ইসলামপুরের শিশু-ভবনে আশ্রয় পেয়েছিল। এ ছাড়াও স্বাধীনতা লাভের পর দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে শত্রুসৈন্যদের বিকৃতরুচির শিকার শত শত কিশোরীকন্যাদেরও সেখানে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। ইসলামপুর শিশুভবনের অধীনে প্রায় ২০ হাজার শিশু মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সাহায্যসেবা পেয়েছে।

উপসংহার: মাদার তেরেজা ১৯৯৭ সালের ১৩ই মার্চ মিশনারিজ অফ চ্যারিটির গুরুদায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সেই বছরই ৫ই সেপ্টেম্বর তিনি কলকাতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাত্র ১৩ জন সদস্য নিয়ে তাঁর সেবাসংঘ শুরু করেছিলেন। অথচ মৃত্যুর সময় তাঁর ধর্মসংঘে সিস্টারের সংখ্যা ছিল ৪ হাজার, ব্রাদার ছিলেন ৩ শত এবং স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষেরও উপরে। বর্তমানে পৃথিবীর ১২৩টি দেশে ৬১০টি সেবাপ্রতিষ্ঠানে এই মহিয়সী নারীর আদর্শে কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আছে এইড্স, কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসাকেন্দ্র, শিশু, নারী ও পরিবার-বিষয়ক পরামর্শকেন্দ্র, মানসিক রোগীদের নিরাময়কেন্দ্র, শারীরিক অসুস্থদের চিকিৎসাকেন্দ্র, অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, হস্তশিল্প কারখানা, হাতের কাজের প্রশিক্ষণকেন্দ্র, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র, প্রার্থনাগৃহ ও অতিথিশালা– ইত্যাদি। বাংলাদেশে মাদার তেরেজার প্রথম সেবাকেন্দ্র ইসলামপুরের শিশুভবন। তারপরে প্রতিষ্ঠিত খুলনা ছাড়াও তেজগাঁয়ে আছে নির্মল হৃদয় কেন্দ্র। সেইসঙ্গে ঢাকার অদূরে মাউসাইদ, সিলেটের খাদিমনগর, মৌলবিবাজারের লক্ষ্মীপুর; বরিশালের গোলপুকুরপাড়, চট্টগ্রামের পাহাড়তলি, ঠাকুরগাঁও, সাতক্ষীরার বড়দল, টাঙাইলের জলছত্র, রাজশাহির মহিষবাথান– প্রভৃতি স্থানে সিস্টারগণ নিঃস্বার্থভাবে মানুষের মধ্যে সেবা ও প্রেমের আদর্শ প্রচার করে চলেছেন।

সারাজীবন নিঃস্বার্থ সেবা আর অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে মানুষের জীবন সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন মাদার তেরেজা। তাঁর কাজে তিনি মানুষকেই একান্তভাবে বড় করে দেখেছেন। তিনি কখনও দেশের তফাৎ, ধর্মের ভিন্নতা, ভাষার পার্থক্য, জাতির স্বাতন্ত্র্য– আমলে নেননি। তাঁর লক্ষ ছিল মানুষের মধ্যে চিরজীবী ঈশ্বরের সেবা ও ভালোবাসা। তাই তাঁর কাজের জন্য তিনি পেয়েছেন অসংখ্য পুরষ্কার। তবে মাদারের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো সব জাতির, সব দেশের মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা। তাইতো আমরা, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব লাভের সুবর্ণ জয়ন্তীতে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। আমাদের এই অর্জনে মাদার তেরেজার অবদান অনস্বীকার্য। তাই আজ তাঁর চরণে নিবেদন করি আমাদের প্রাণের প্রণাম।